গোয়েন্দা গল্প

বাঘের নখ

অদ্রীশ বর্ধন

"বাঘের হাড় ? কলকাতায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কলকাতায় ।"

"টাকা ফেললে বাঘের দুধ পাওয়া যায় জানতাম । বাঘের হাড়-ও ?"

"ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে ।"

কথা হচ্ছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর তুহিন চাকীর মধ্যে । তুহিনবাবু জাঁদরেল সরকারি অফিসার । পুব ভারতের বন–জঙ্গল তাঁর নখদর্পণে । বুনো প্রাণীরা যাতে বহাল তবিয়তে থাকে, তা দেখেন । যাদের বংশ লোপ পেতে চলেছে, তাদের রক্ষা করেন ।

ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু বন–জঙ্গলের মানুষ বলে মনে হয় না । রোদে জলে রংও পুড়ে যায়নি । যেমন ফরসা তেমনই তৈলমসৃণ উজ্জ্বল মুখশ্রী । চকচকে টাক দখল করছে মাথাকে । ফলে, চওড়া কপাল আরও চওড়া হয়েছে । চশমাপরা চোখে, মস্ত কপালে বুদ্ধি ঝলমল করছে । লম্বা, ঋজু শরীরটায় নিপাট স্বাস্থ্যের রোশনাই । মুখে হাসি, কথায় বিনয়, উচ্চারণে উচ্চ শিক্ষা—এই মানুষ বনে-জঙ্গলে টো-টো করেন, মানুষখেকো বাঘকে ঘুমপাড়ানি বুলেট মেরে অজ্ঞান করেন, সাপের চামড়ার চোরা চালান বন্ধ করেন, ভাবতেও অবাক লাগছে ।

ইন্দ্রনাথ বলল, "বাঘের হাড় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন ?"

"বাঘের হাড় বেচে যে লাখপতি হয়েছে, তার জান যে যেতে বসেছে ।"

"বাঘের হাড়ের এত দাম ?"

"চিনদেশে ওষুধপত্র তৈরি হচ্ছে যে বাঘের হাড় থেকে ।"

"চিনের ওষুধে বাংলার বাঘ ?"

"শুধু বাংলার নয়, ইন্দ্রনাথবাবু, সুমাত্রা আর জাভা, বালি আর পারস্য, মাঞ্চুরিয়া আর রাশিয়া সব জায়গা থেকেই বাঘের হাড় যাচ্ছে চিনের কারখানায় ।"

"কিন্তু বাঘ মারা তো নিষেধ ?"

"কে শুনছে ? নেই-নেই করেও এখনও তো হাজারছয়েক বাঘ রয়েছে পৃথিবীতে । সাইবেরিয়া যাদের আদিভূমি সেখানেই শুধু এরা নেই । বরফ-প্রান্তরে থেকে অভ্যেসও খারাপ করে ফেলেছে । গরম একদম সইতে পারে না । লম্বা ঘাসের মধ্যে, জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে বসে থাকে—মানুষকে সমীহ করে, ভয়ও পায়—সেই মানুষই এদের সাবাড় করে আনছে । এশিয়ার বন-জঙ্গলই এখন ওদের ঠাঁই । নিস্তার নেই সেখানেও," বলতে-বলতে যেন চোখ ছলছল করে উঠল তুহিনবাবুর । গলা ভারী হয়ে এল ।

নরম গলায় ইন্দ্রনাথ বলল, "বাঘ শিকার তো একসময়ে মস্ত বাহাদুরির ব্যাপার ছিল ।"

"বাহাদুরির বাড়াবাড়ি দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে, বিশেষ করে বন্দুক আবিষ্কারের পর । শুধু ১৮৭৭ সালেই ১,৫৭৯টা বাঘ মারা হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় । আর এখন ? গোটা ইণ্ডিয়ায় পাবেন খুবজোর সাড়ে চার হাজার, সুন্দরবনে পাবেন শ'তিনেক ।"

"কিন্তু এখন তো খোদ গভর্নমেন্টই বাঘ মারার বিরুদ্ধে । আপনারা নজর রেখেছেন । তা সত্ত্বেও বাঘ মরছে ?"

"সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আয়তন জানেন ? ২,৫৮৬ বর্গ কিলোমিটার । এর অনেকটাই জুড়ে রয়েছে নদী, নালা, খাঁড়ি আর গভীর বন । চোরাশিকারিদের স্বর্গ । বাঘের হাড় এখন বাঘের চামড়ার চাইতেও দামি । নইলে লাখ-লাখ টাকা কামায় কী করে ঢোলগোবিন্দ সরকার ?"

"যার জান যেতে বসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ।"

"তার জন্যে আপনি ছুটে এসেছেন ?"

"এক সময়ে নিজে বাঘ মেরেছে, ভাড়াটে শিকারি দিয়ে মারিয়েছে—এখন সুবুদ্ধি হয়েছে । চোরাশিকার বন্ধ করার জন্যে আমাকেই খবর দিয়ে যাচ্ছে ।"

"তাই তার জান-টা আপনি বাঁচাতে চান ?"

"আজ্ঞে ।"

"কিন্তু তার জান নেবে কে ? বাঘের ভূত ?"

"একজন অভিজ্ঞ চোরাশিকারি । এক সময়ে ছিল ঢোলগোবিন্দর ডান হাত । এখন তার যম । লোকটার নামও অদ্ভুত । টাটু মহারাজ ।"

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ, "বিউটিফুল নাম । টাটু মহারাজ কি খুনের হুমকি দিয়েছে

ঢোলগোবিন্দকে ?"

"স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের কথা শোনাতে দিনসাতেক আগে চলে এসেছে ঢোলগোবিন্দর কাছে।"

"স্বপ্নটা কী ?"

"ঢোলগোবিন্দর গলায় বাঘের নখ বসেছে। একটানে ছিঁড়ে দিয়েছে টুঁটি।"

"রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। শুনেই ঘাবড়ে গেছে ঢোলগোবিন্দ সরকার ?"

"সে নির্বিকার। দেখলে বুঝবেন কী জিনিস। যে-বাঘের গর্জন শুনলে লোকে জ্ঞান হারায়, এ সেই বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভুরুর মাঝে গুলি চালায়। স্বপ্নের কথায় সে মজা পেয়েছে।"

"তা হলে ভয়ে কাঁপছে কে ?"

"তার ছেলে। একমাত্র সন্তান। মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। হস্টেলে থেকে পড়াশুনো চালিয়েছে। বাবাই তার চোখের মণি। দুর্দান্ত বাপের ঠিক উলটো। পয়লা নম্বর ভিতু। টাট্টু মহারাজকে দেখে আর তার মুখে স্বপ্নের কাহিনী শুনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। থানায় যায়নি, বাবাকে নিয়ে চলে এসেছে আমার কাছে। বলছে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ দরকার।"

"কলকাতায় এসেছে ?"

"বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি।"

"নিয়ে আসুন।"

ঘরে ঢুকল ঢোলগোবিন্দ সরকার। বাঘের মতোই নিঃশব্দে। চোখ দুটোও বাঘের চোখের মতো কটা। উচ্চতায় মাঝারি। তবে বোতাম-খোলা কলারওলা নীল গেঞ্জি-শার্টের ফাঁক দিয়ে ঠেলে উঠছে কাঁধের মাস্‌ল, বাহুর মাস্‌ল আর বুকের উল্কি-বাঘ। বাঘের মুণ্ডটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। বড় জুলপি আর মোটা গোঁফেও সাদা চুল। চৌকো চোয়াল। থ্যাবড়া নাক। শক্ত ঠোঁট। মুখের চামড়ায় অজস্র রেখা। কপালে, চোখের কোণে, নাকের পাশে, ঠোঁটের প্রান্তে। চামড়া পুড়ে ঝলসে গেছে রোদের আঁচে। লোকটাকে দেখলেই অসুর-অসুর মনে হয়। ভেতরটাও নিশ্চয় তাই। কটা চোখের আড়ালে নৃশংসতা যেন লুকিয়ে থাকতে পারছে না।

পেছন-পেছন এল তার ছেলে। বাবার চেয়ে একটু লম্বা। গায়ে মাস্‌ল বেশি না থাকলেও, বেশ চাবুক-চেহারা। মুখের গড়ন অনেকটা বাবার মতো। শুধু চৌকো নয় চোয়াল, চোখেও নেই প্রচ্ছন্ন নৃশংসতা। ভয়ের মলম মাখানো রয়েছে যেন চোখে। চাহনি চঞ্চল।

সকলের পেছনে এলেন তুহিন চাকী। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলের নাম মাধব সরকার। সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। এখন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে পোস্টাল ডিপ্লোমা কোর্স পড়ছে। বয়স বাইশ।

মামুলি কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রনাথ বলল, "মাধব, তুমি ভয় পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, কাকু।"

"কিন্তু স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় ?"

"হুমকি তো সত্যি হতে পারে।"

"তুমি বলতে চাও, টাট্টু মহারাজ নিজেই খুন করবে তোমার বাবাকে ?"

"তার গলায় ঝোলে বাঘ-নখ। রুপোয় বাঁধানো।"

নিঃশব্দে হাসল ঢোলগোবিন্দ। যেন বাঘের দাঁতখিঁচুনি। কিছু বলল না।

কিন্তু রেগে গেল মাধব, "তুমি এখনও হাসছ ? তোমার রাশিচক্রে লেখা নেই, মৃত্যু হবে এ-বছরেই ?

"সেটা যে বাঘের নখে হবে, তা তো লেখা নেই," এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ঢোলগোবিন্দ। গলার আওয়াজে কিন্তু বাঘের ডাক নেই। রয়েছে মেয়েলি তীক্ষ্ণতা। বাঘশিকারির গলা যে এত সরু হয়, তা জানা ছিল না।

"কিন্তু তুমি বাঘের নখে মরতে চাও না বলেই বাঘ শিকার ছেড়ে দিয়েছ।"

"বড্ড বাজে বকছিস," ঢোলগোবিন্দর গলায় এবার বিরক্তি।

ইন্দ্রনাথ বলল, "মাধব, তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো ?"

"করি। নিজেও চর্চা করি। কাগজ দিন," বলে নিচু টেবিলের তলায় রাখা স্লিপ প্যাড টেনে নিয়ে বুকপকেট থেকে ডট পেন বের করে বাঁ হাতে ঝপাঝপ আঁকল একটা রাশিচক্র। গড়গড় করে বলে গেল, অমুক গ্রহ অমুক জায়গায় রয়েছে বলে বাবার মৃত্যুর আর দেরি নেই।

নিঃশব্দে হেসে গেল ঢোলগোবিন্দ। ইন্দ্রনাথ শুনেটুনে বললে, "ডিটেকটিভ কি মৃত্যু আটকাতে পারবে ?"

রুখে উঠল মাধব, "চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ? ওইরকম একটা স্বপ্নের কথা শুনলে কার না সন্দেহ হয় ? সব শুনেও চুপ করে বসে থাকা যায় ?"

"শুধু স্বপ্ন ? না কথাও আছে তার মধ্যে ?"

"আছে। বটগাছের ডালে বসে কে যেন বলেছে, বাবার গলা ফাঁড়বে বাঘ-নখ। তারপরেই দেখা গেছে, বাবা পড়ে রয়েছে, চিত হয়ে—বাঘ-নখ ঢুকে রয়েছে টুঁটিতে," বলতে-বলতে শিউরে উঠল মাধব।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর বলল, "চলো, শহরতলির শয়তানকে দেখে আসা যাক।"

তুহিনবাবুর গাড়ি যখন পৌঁছল ঢোলগোবিন্দর বাড়িতে, শীতের সূর্য তখন গাছের মাথায় নেমে পড়েছে। দূর থেকে বাড়ির চেহারা দেখে অবাক হয়েছিলাম। অনেক শিবমন্দির যেন গায়ে-গায়ে লাগানো। মোচার মতো গড়ন। গাছপালার ওপর দিয়ে প্রথমে দেখা গিয়েছিল চুড়োগুলো। ফটক পেরিয়ে বাগানে গাড়ি ঢোকার পর দেখলাম, প্রতিটা চুড়োর নীচে দুটো করে জানলা, ইস্পাতের পাল্লা আঁটা। দরজা মোটে একটা। মন্দির প্যাটার্নের এক-একটা ঘর যেন এক-একটা কেল্লা। এরকম অদ্ভুত বাড়ি জীবনে দেখিনি। জিজ্ঞেস করে জানলাম, শিবভক্ত এক জমিদার তৈরি করেছিলেন এই বাগানবাড়ি। একটা ঘর থেকে আর-একটা ঘরে যাওয়া যায় পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে। গোটা বাড়ির তলায় রয়েছে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। ঢোলগোবিন্দ সেইসব সুড়ঙ্গের নকশাসমেত গোটা বাগানবাড়ি কিনে নিয়ে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়েছে। শুনে মনে-মনে বলেছিলাম, শখের বলিহারি। যেমন ছিল পেশা, তেমনই হয়েছে আস্তানা।

বাইরের দিকের নাটমন্দিরের মতো বসবার ঘরটায় মিনিটদশেক বসেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, বিচিত্র এই শিব-পুরীর তলার গোলকধাঁধা-সুড়ঙ্গে ঘুরব। কিন্তু ইন্দ্রনাথ হাতঘড়ি দেখে বলল, "টাট্টু মহারাজকে এখানে ডাকতে হবে না, আমিই যাব তার বাড়ি।"

তুহিনবাবু গাড়ি করে নিয়ে গেলেন। বিলের ধারে একটা একতলা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে বললেন, "পাড় দিয়ে চলে যান। আমি এখানেই রইলাম।"

ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলে দিব্যি চালানো যায়। চারপাশ নিঝুম। বাঁশের ফটক খুলে ইট পাতা সরু রাস্তায় পা দিতেই বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে একটা মিশকালো ছেলে এসে বাইরে দাঁড়াল। তার পরনে হাফপ্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। নিগ্রো-নিগ্রো চেহারা। ছোট চুল, সরু কপাল, ভোঁতা নাক, উঁচু হনু।

কালো বাঘের মতোই সে ছিটকে চলে এল আমাদের সামনে। পথ আগলে দাঁড়িয়ে

বলল রুক্ষ গলায়, "কী চাই ?"

"টাটু মহারাজের চ্যালা বুঝি ?" হেসে-হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, "যাও বাবা, তোমার কর্তাকে গিয়ে বলো, কলকাতা থেকে পুলিশের লোক এসেছে।"

ছোকরার চোখ দুটো একটু চমকে উঠল। সামলে নিল তখনই। পেছন ফিরে উধাও হয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, "আসুন।"

চৌকাঠ পেরিয়ে প্রায় অন্ধকার গলি। ডান দিকের ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। তক্তপোশে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে একটা কালো কুচকুচে মূর্তি। গায়ে খয়েরি আলোয়ান জড়ানো।

মোলায়েম গলায় মূর্তি বলল, "আসুন। ঢোলগোবিন্দ পুলিশ ডেকেছে ? এত ভিতু হয়েছে আজকাল ? চোর কোথাকার। পাপের সাজা এইভাবেই হয়।"

আমি আর ইন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে তক্তপোশেই বসলাম। বসবার অন্য চেয়ার তো নেই। হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা গলি দিয়ে চলে গেল ভেতর দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, "আমরা পুলিশ নই। তবে পুলিশ আমাদের পেছনে আছে।"

মিশকালো মূর্তি পলকহীন চোখে দেখছিল ইন্দ্রনাথকে আর আমাকে। আর আমি দেখছিলাম লোকটার কাঠখোট্টা মুখাবয়ব। রসকষ একেবারে নেই। জ্যান্ত কঙ্কাল বললেই চলে। হাড়ের ওপর টান-টান করে লাগানো যেন চামড়া। চোখ দুটো খুব সাদা। হ্যারিকেনের আলোয় শ্বাপদের চোখের মতো জ্বলছে।

সে বলল, "পুলিশ নয় ? তবে কী ?"

"ডিটেকটিভ। এর পর আসবে পুলিশ। আপনি ঢোলগোবিন্দ সরকারকে খুনের ভয় দেখাচ্ছেন ?"

জীবন্ত কঙ্কাল বলল, "ভুল। যার মনে পাপ, সে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এইভাবেই করবে। আপনি সব শুনুন। তারপর যা করবার করবেন। আমিও চলে যাচ্ছি পরশু। বাড়িভাড়া দেওয়ার টাকা নেই। এই তো বাড়ি তাই খালি পেয়েছি। ইচ্ছে ছিল, ঢোলগোবিন্দর মড়াটা দেখে যাব, কিন্তু বড্ড দেরি হচ্ছে স্বপ্নটা ফলতে।"

"আপনার বিশ্বাস, স্বপ্ন ফলবেই ?"

"না বিশ্বাস করলে সুন্দরবন থেকে এত খরচ করে এলাম কেন ? বনে-জঙ্গলে থাকি, বাঘ, কুমির, সাপের সঙ্গে ঘর করি। যা বললাম, তা মিথ্যে হবে না।"

"কিন্তু এখানে তো বাঘ থাকে না, তবে বাঘ-নখ ঝুলছে আপনার গলায় !"

ঝলসে উঠল শ্বাপদ চক্ষু, "সে-খবরও পেয়েছেন। হ্যাঁ, ঝুলছে, এই দেখুন।"

বলেই একটানে খুলে ফেলল গায়ের আলোয়ান। দেখলাম, কালো কার বাঁধা রুপোয় বাঁধানো প্রকাণ্ড বাঘ-নখ। এক সময়ে কত রক্তই না-জানি লেগেছিল এই নখে, রক্তের নেশা এখনও যায়নি। গা-শিরশির করে উঠল আমার।

টাটু মহারাজের গলায় এবার শোনা গেল টিটকিরি, "এই দেখেই চমকে উঠলেন ? পিঠ দেখলে তো মূর্ছা যাবেন।" বলেই, দেওয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরল আমাদের দিকে। আলোয়ান পিছলে নেমে যেতেই সত্যিই আঁতকে উঠলাম। কোনাকুনিভাবে একটা কাটাছেঁড়ার দাগ বীভৎস করে তুলেছে গোটা পিঠটাকে। মাংস আর চামড়া তালগোল পাকিয়ে ক্ষতস্থান জুড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু গোটা পিঠটার জ্যামিতি পালটে দিয়েছে।

আলোয়ান ঢাকা দিয়ে আবার ঘুরে বসল টাটু মহারাজ। বুকের বাঘ-নখ এক হাতে তুলে ধরে বলল, "এই নখের কীর্তি। এরই আর-একটা নখ ঢোলগোবিন্দকে বাঁধিয়ে উপহার দিয়েছি, ষড়যন্ত্রের স্মৃতি হিসেবে।"

"ষড়যন্ত্র ?"

"আমাকে খতম করার ষড়যন্ত্র। সুন্দরবনে কখনও গেছেন ? না, না, লঞ্চে চেপে যে সুন্দরবন আপনি দেখেছেন, আর আমার জানা সুন্দরবন একেবারে আলাদা। দু'-তিন হাজার বছর আগেও গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ছিল সমুদ্রের তলায়। আজও সেখানে জোয়ারের জলে বেশিরভাগ বন ডুবে থাকে। এক সময়ে রাজারাজড়ারা অনেক ইমারত বানিয়েছিল, এখন আছে ধ্বংসস্তূপ। ভাটার সময় জেগে ওঠে। আমি এইরকম একটা ভাঙা প্রাসাদের পাতাল ঘরে পেয়েছিলাম চার ঘড়া সোনার মোহর। বাদশাহি মোহর। আনন্দে নেচে উঠে খবরটা দিয়েছিলাম ঢোলগোবিন্দকে। তখনই নিয়ে যেতে পারিনি—জোয়ারের জলে পাতালঘর ডুবে গেছিল বলে। ভাটার টান শুরু হওয়ার আগেই ঢোলগোবিন্দকে খুঁজতে গিয়ে দেখি সে নেই। বাঘের বাচ্চাটাও নেই।"

"বাঘের বাচ্চা ?"

"অন্ধ বাচ্চা। জন্মের চোদ্দদিন পরে ওদের চোখ ফোটে। সেইদিনই একটা বাচ্চা জোগাড় করেছিলাম। প্ল্যান ছিল, বাঘিনীকে লোভ দেখিয়ে এনে গুলি করে মারব। বাচ্চা নেই, ঢোলগোবিন্দও নেই দেখে ভাবলাম, বাঘিনীর পেটে গেছে। নিজেই চলে গেলাম ভাঙা প্রাসাদে। বাঘ গরম সইতে পারে না। ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। সেদিন বাঘের বাচ্চাকে ওই বাড়ির মধ্যে রেখেই গাছে উঠে বসেছিল ঢোলগোবিন্দ। আমি যেই ঢুকেছি, বাচ্চার গন্ধে বাঘিনীও ঢুকেছে। গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা ওদের অসাধারণ। বাচ্চার গন্ধ আর মানুষের গন্ধ—আর যায় কোথায়। প্রথমেই থাবা চালাল কাঁধ লক্ষ্য করে, যা ওদের টাকটিক্স। কিন্তু আমি ছিটকে যেতেই পিঠ চিরে দু'ফালা হয়ে গেল—ঘুরেই বন্দুক চালিয়েছিলাম। সেই বাঘিনীর একটা নখ এই গলায়। থাবা আর গোঁফ চালান দিয়েছি মালয়ে।"

"থাবা আর গোঁফ ? বাঘের ?"

"ওই দিয়ে কবচ ওরা বানায়। ভাল দাম পেয়েছি। হাড় বেচেছে ঢোলগোবিন্দ।"

"মোহর ?"

"ও নাকি পায়নি। মিথ্যে কথা। তারপরেই ব্যবসা ছেড়ে এখানে বাড়ি কিনেছে। আর আমাদের নাড়িনক্ষত্র ফরেস্ট অফিসে জানাচ্ছে। স্বপ্নে ওর পাপের সাজা দেখে তাই ছুটে এসেছিলাম। মোহর বেচা টাকায় কেনা বাড়িটা দেখে গেলাম, মড়াটা দেখা হল না। আর কিছু জানতে চান ?"

"না," বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। শিব-পুরীতে ফিরে ঢোলগোবিন্দকে বলল, "রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘুমোন ?"

শব্দহীন অট্টহাস্য করে ঢোলগোবিন্দ বলল, "তা ঘুমোই। তবে পাতাল-সুড়ঙ্গগুলো টাটুকে দেখিয়েছি।

ক্ষমতা থাকে তো আসুক সেই পথে।"

অট্টহাস্য মিলিয়ে গেলে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আপনার বাঘ-নখ কোথায় ?"

"আমার ছেলের গলায়," বলে বাঘের চাহনি মেলে একদৃষ্টে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া দেখে গেল ঢোলগোবিন্দ।

পরের দিন দুপুর নাগাদ আবার এলাম শিব-পুরীতে। এ-নাম আমার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে। শিবমন্দিরের মতো যে বাড়ির গঠন, তাকে শিব-পুরী ছাড়া কী বলব ?

ইন্দ্রনাথ আগের রাতে বাড়ি ফেরেনি। কুমোরটুলিতে নেমে গেছিল এক বন্ধুর বাড়িতে রাতে আড্ডা মারবে বলে। আজ ভোরবেলা সেখান থেকেই একটা চৌকো বাক্স নিয়ে এসেছিল ওর সুভাষ সরোবরের বাড়িতে। তুহিনবাবু গাড়ি নিয়ে যখন পৌঁছলেন আমি তার আগেই গিয়ে দেখেছিলাম বাক্সটা। বাইরে তালা ঝুলছে। ভেতরে কী আছে, তা বলেনি ইন্দ্র।

শিব-পুরীতে এই বাক্স নিয়েই এল ইন্দ্রনাথ। মনে আছে, সেদিন ছিল বেস্পতিবার। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এল বাপ-বেটা দু'জনেই। মাধবের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ আগের চেয়েও বেড়েছে। কারণটাও শুনলাম। কাল রাতে এ-বাড়ির একমাত্র অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে কেউ খুন করে আগুনে ঝলসাচ্ছিল। আগুন জ্বলছিল বাগানে। তখন রাত একটা। মালীর ঘুম ভেঙেছিল সকলের আগে। বাবাকে নিয়ে মাধব গিয়ে দেখেছিল বীভৎস সেই দৃশ্য। শুকনো ঝরাপাতা জড়ো করে আগুন জ্বালা হয়েছে। দু'পাশে দুটো খুঁটি পুঁতে আড়াআড়ি কাঠ বাঁধা হয়েছে খুঁটি দুটোর মাথায়। কুকুরের দেহ ঝুলছে আগুনের ওপর। তার সামনের দুটো পা আর পেছনের দুটো পা আলাদা ভাবে বাঁধা। আড়াআড়ি কাঠটা গলিয়ে দেওয়া হয়েছে বাঁধা পায়ের মধ্যে দিয়ে।

বাইরের ঘরে বসে সব শুনলাম। বলে গেল মাধব। চুপ করে রইল ঢোলগোবিন্দ। ঠিক যেন চৈনিক মুখ। মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না।

সব শেষে মাধব বলল, "নিশ্চয় টাট্টু মহারাজের কাজ। খুনের হুমকি যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, তার প্রমাণ। এ-বাড়ি পাহারা দিত এই কুকুর। আজ রাত থেকে সে আর পাহারা দেবে না।"

"আমরা দেব," বলল ইন্দ্রনাথ। "আমাদের থাকার ব্যবস্থা করো।"

রয়ে গেলাম সেই রাতে। কিছু ঘটল না। শুক্রবার সকালে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। ঘন্টাখানেক পরে ফিরে এল। বলল, "ভোরের হাওয়া খেয়ে এলাম। চমৎকার বিল। কিন্তু টাট্টুর দেখা পেলাম না। কথা রেখেছে। বাড়ি খালি। সুন্দরবনেই রওনা হয়েছে। মাধব, আর তোমার ভয় নেই।"

শুকনো হেসে মাধব বলল, "বাঁচলাম।"

ইন্দ্র বলল, "মৃগাঙ্ক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখে। পাতাল-সুড়ঙ্গ দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে। মাধব, যাও না সঙ্গে।"

দেখলাম বটে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। সারাজীবন মনে থাকবে। ইট দিয়ে বাঁধানো। সিধে হয়ে হাঁটা যায়। ঢোলগোবিন্দ সেখানে ইলেকট্রিক লাইন টেনেছে। আলোয় ঝলমল করছে। তা সত্ত্বেও গা-ছমছম করছিল সুড়ঙ্গের ঘুরপাক দেখে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কথা বলছিলাম তাই ফিসফিস করে। দেখছিলাম মূল সুড়ঙ্গের গা থেকে একটার-পর-একটা সরু সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে দিয়ে মাথা হেঁট করে হাঁটতে হয়। প্রত্যেকটা সুড়ঙ্গ ওপর দিকে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে শিব-পুরীর এক-একটা ঘরের দেওয়াল আলমারির মধ্যে। পাল্লা খুললেই ঢোকা যায় ঘরে।

ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরের আলমারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমেছিলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে। উঠেও এলাম সেই ঘরে। ইন্দ্রনাথ আর তুহিনবাবু নীচে নামেনি। খোশ গল্প করছিল ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে। আমরাও জমে গেলাম বাঘের গল্পে। ঢোলগোবিন্দর মতো ঠোঁটচেপা মানুষেরও মুখ খুলিয়ে ছেড়েছে ইন্দ্রনাথ। ভয়াল ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের গল্পে আসর মাতিয়ে দিয়েছে। শুনতে-শুনতে রাত হল গভীর। খেলাম কব্জি ডুবিয়ে। গরম রুটি আর মুরগির মাংস। তারপর দই।

মাধব হাই তুলছিল অনেকক্ষণ থেকেই। টাট্টু মহারাজ তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেওয়ায় মনও ওর হালকা। উদ্বেগ চলে গেলে ঘুম তো আসবেই।

ইন্দ্রনাথ বলল, "যাও, যাও, টেনে ঘুমোও। ঢোলগোবিন্দবাবু, আপনিও ঘুমোন। দেওয়াল-আলমারিতে তালা দিয়েছেন ?"

আবার শব্দহীন অট্টহাসি হেসে ঢোলগোবিন্দ বলল, "টাট্টু যখন ছিল, তখনও দিইনি, এখনও দেব না।"

মাধব বলে উঠল, "বাবা, তোমার এই গোঁয়ার্তুমি..."

থেমে-থেমে ঢোলগোবিন্দ বলল, "তোর বুকে বাঘ-নখ ঝুলিয়েছি কেন ?"

"প্রতিহিংসা তো পরে, তোমাকে তো আর ফিরে পাব না।"

"আমার সব সম্পত্তি তো পাবি।"

আমার আর ইন্দ্রনাথের শোবার জায়গা হয়েছিল একটা শিব-ঘরে। তুহিন চাকী শুতে গেলেন অন্য ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, "মৃগ, আলোটা নিভিয়ে দাও।"

দিলাম।

ও বলল, "টর্চ নাও।"

নিলাম।

"আলমারির পাল্লা খোলো। নিয়ে চলো ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে।"

পাল্লা খুলে, টর্চ জ্বালিয়ে, সুড়ঙ্গে নামবার সিঁড়িতে পা দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মতলব কী ?"

"নাটক দেখা। ব্যস, আর প্রশ্ন নয়। চলো।"

ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। সত্যিই আলমারির পাল্লায় তালা দেওয়া ছিল না। আমি আর ইন্দ্রনাথ যে-কোণে লুকিয়ে রইলাম আলনার জামাকাপড়ের আড়ালে, তার সামনাসামনি রয়েছে দেওয়াল-আলমারি। আলমারি আর আমাদের মাঝে রয়েছে খাট। ঢোলগোবিন্দ এর মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শীতের রাতে জানলার ইস্পাত-পাল্লা বন্ধ।

ঘরে নিকষ অন্ধকার, কিন্তু রুমাল দিয়ে টর্চের মুণ্ড মুড়ে নিয়ে যখন ঢুকেছিলাম ঘরে, তখনই আবছা আলোয় দেখেছিলাম চাদর মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে ঢোলগোবিন্দ। মাথায় বালিশ নেই। তার কারণ একটু আগেই গল্পের আসরে শুনেছি। শিরদাঁড়ার তিনটে হাড় ক্ষয়ে গেছে ঢোলগোবিন্দর। বালিশ ছাড়া ঘুমোলে আরাম পায়।

ঘণ্টাখানেক এইভাবেই বসেছিলাম। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছিল। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আলমারির পাল্লা।

খুব আস্তে খুট করে আওয়াজ হতেই লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। টেনে ধরে রইল ইন্দ্রনাথ। টর্চ জ্বালাতেও পারলাম না। টর্চ রেখেছে নিজের হাতে। তাই উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসেই রইলাম।

একটু-একটু করে ফাঁক হচ্ছে আলমারির পাল্লা। পেনসিল-টর্চের আলো এসে পড়ল খাটে। নিভে গেল। একতাল জমাট অন্ধকার বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। নিঃশব্দে যেন পিছলে এল খাটের মাথার দিকে। তারপরেই শব্দ হল, খ্যাচ।

সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠল ইন্দ্রনাথের হাতের টর্চ। এখন আর টর্চের মুণ্ড জড়ানো নেই রুমাল দিয়ে। তিন ব্যাটারির জোরালো আলো সটান গিয়ে পড়ল নিশাচরের মুখের ওপর।

সেই ছেলেটা। মিশকালো নিগ্রো-নিগ্রো আকৃতি। টাট্টু মহারাজের চ্যালা। খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরেই সে এসেছে এই শীতের রাতে। হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সাঁত করে সেই মুখ আর গোটা শরীরটা ছিটকে গেল আলমারির গহ্বরে। দ্রুত পায়ের শব্দ নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

আমি খাট ঘুরে দৌড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথ শর্টকাট করেছিল। সময় এলে ও যে শরীরী বিদ্যুৎ হয়ে যেতে পারে, আবার সেই প্রমাণ দেখিয়েছিল।

এক লাফে খাট ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ল আলমারির সামনে। আমি রইলাম তার পেছনে। সিঁড়িতে হাতড়ে-হাতড়ে যখন পা রাখলাম, টর্চ নিয়ে ইন্দ্রনাথ তখন উধাও।

নিঃসীম অন্ধকারে সুড়ঙ্গে পা দিয়ে কী করব যখন ভাবছি, ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই শুনলাম পিস্তল নির্ঘোষ, মাত্র একবার। সেইসঙ্গে অস্ফুট কাতরানি। পরক্ষণেই ইন্দ্রনাথের হাঁক, "মৃগাঙ্ক, এইদিকে চলে এসো। নাটক শেষ হয়েছে।"

এখন আমরা সবাই ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে। খাট ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, ইন্দ্রনাথ, তুহিনবাবু, মাধব আর....

ঢোলগোবিন্দ।

খাটেও শুয়ে আছে ঢোলগোবিন্দ। তার টুঁটি ছিঁড়ে দু'টুকরো। কিন্তু রক্ত-টক্ত কিছুই বেরোচ্ছে না। মুখও অবিকৃত। যেমন ঘুমোচ্ছিল, তেমনই ঘুমোচ্ছে।

কারণ, খাটের এই ঢোলগোবিন্দ মোম দিয়ে তৈরি। শুধু মুণ্ড আর টুঁটি। জ্যান্ত ঢোলগোবিন্দর মতোই মনে হচ্ছে। কুমোরটুলিতে একরাত থেকে মোম-শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করেছিল ইন্দ্রনাথ। ঢোলগোবিন্দকে ও দেখে গিয়েছিল, শিল্পী দেখেনি। ইন্দ্রনাথের মুখের বর্ণনা শুনে তৈরি করে দিয়েছিল আশ্চর্য মুণ্ড—যা টর্চের আলোয় আচমকা দেখলে জ্যান্ত মুণ্ড বলেই মনে হয়।

মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে দুটো মূর্তি। মিশকালো সেই ছোকরা। আর টাট্টু মহারাজ। দু'জনেরই পায়ের ডিম থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ছোকরার পায়ে রুমাল জড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে ইন্দ্রনাথ। টাট্টু মহারাজের পায়ের ডিম থেকে ছুরিটা খোলেনি, মাসল এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে রয়েছে।

যন্ত্রণা জড়ানো গলায় টাট্টু বলল, "ছুরিটা খুলে নাও ঢোলগোবিন্দ, পুরো বাঁ দিকটা যে অসাড় হয়ে যাচ্ছে।"

ঢোলগোবিন্দ তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় বলল, "বাকি জীবনটা ওইভাবেই অসাড় হয়ে থাক। ইন্দ্রনাথবাবু গিয়ে না পড়লে ওই ছুরি তো আমার বুকে বিঁধত।"

খেঁকিয়ে ওঠে টাট্টু, "ওর ছুরি কখনও ফসকায় না, এই ডিটেকটিভটা পেছন থেকে লাফিয়ে না পড়লে...."

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেইরকমই। মিশকালো জল্লাদকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে টাট্টু মহারাজ অপেক্ষা করছিল সুড়ঙ্গে। পেছন থেকে ঢোলগোবিন্দ এসে যেই তাকে জাপটে ধরেছে, ঠিক তখনই ইন্দ্রনাথের তাড়া খেয়ে ছোকরা এসে গিয়েছিল সামনে। ইন্দ্রনাথের টর্চের আলোয় দুই মূর্তিকে ঝটাপটি করতে দেখে নিমেষে প্যান্টের পকেট থেকে ছুরি বের করেছে, ফলা খুলেছে, মেরেছে ঢোলগোবিন্দর পিঠ লক্ষ্য করে। ইন্দ্রনাথের পদাঘাতে ছুরি বিঁধেছে টাট্টুর পায়ে।

তুহিনবাবু হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন বললেন, "ব্যাপারটা কী হল ইন্দ্রনাথবাবু?"

"নাটক," বলল ইন্দ্রনাথ "গোয়েন্দাগিরিতে এ-জিনিসটা না থাকলে জমে না। আমার ঘরে বসে মাধব যখন রাশিচক্র আঁকছে তখনই লক্ষ করেছিলাম ও ন্যাটা। তারপর শুনলাম একই বাঘিনীর নখ মাধব আর টাট্টুর গলায়। স্বপ্নটা দেখেছে কিন্তু টাট্টু। অমনি কল্পনায় দেখতে পেলাম টাট্টুর ফন্দি। ঢোলগোবিন্দ খুন হবে। ওরই বাঘ-নখে, কিন্তু দোষ চাপবে মাধবের ঘাড়ে। কারণ, পুলিশ দেখবে এ-খুনে লাভ কার? না, মাধবের। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে। টাট্টু তাই স্বপ্নের কথা ছড়িয়েছে ফলাও করে, পুলিশ তা বিশ্বাস করবে না, তারা দেখবে প্রমাণ।"

"প্রমাণটাই তো আসল," বললেন তুহিনবাবু।

"এই দেখুন সেই প্রমাণ," মোমের মুণ্ডের টুঁটিতে আঙুল রাখল ইন্দ্রনাথ, "বাঘ-নখ বসেছে বাঁ দিকে। ন্যাটা হাতে ঠিক তাই হয়। আলমারি থেকে বেরিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লে বাঘ-নখ টুঁটির বাঁ দিক দিয়েই গলায় ঢুকত। কিন্তু আমি দেখেছি, ছোকরা খাটের পেছনে এসেছিল। ডান হাত শূন্যে তুলে বাঘ-নখ দিয়ে টুঁটি ছিঁড়েছে, যাতে মনে হয়, আলমারি থেকে বেরিয়েই হেঁট হয়ে সামনের দিক থেকে গলার বাঁ দিকে বাঁ হাতে বাঘ-নখ ঢুকিয়েছে মাধব।"

ফাঁস করে উঠল টাট্টু মহারাজ, "এখনও আপনি কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। ঘোড়ার ডিমের ডিটেকটিভ! গুলি আপনিই চালিয়েছেন, আমার চ্যালার পা ফুটো করে দিয়েছেন।"

"না চালালে ওর আর-এক পকেট থেকে যে আর-একটা ছুরি বেরিয়ে আসত," বলে হেঁট হয়ে টাট্টু মহারাজের মিশকালো সাগরেদের হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বের করল ইন্দ্রনাথ, "ছোরার জাদুকর, তোমার খেল খতম, নাটকও শেষ। মাধব, ডাক্তার ডাকো, তিনিই খুলবেন ছুরি, বাঁধবেন ব্যান্ডেজ, নইলে রক্তপাতেই যে মরে যাবে টাট্টু, ওই তো চেহারা!"

দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠেছিল জীবন্ত কঙ্কাল।

এর কিছুদিন পরেই চার ঘড়া মোহর বেচার টাকা জমা পড়েছিল একটা বিখ্যাত সমাজকল্যাণ সংস্থায়। কে এত টাকা পাঠিয়েছে, তা কিন্তু জানা যায়নি।

জানি শুধু আমরা ক'জন।

ছবি : অনুপ রায়